বিজ্ঞান চর্চা ও নারীবাদ

শেফালি মৈত্র

নারীবাদীরা সমাজ জীবনে একটি সঠিক বিপ্লব ঘটানোর কথা বলে। এঁরা মনে করেন সব আধুনিক সমাজে পিতৃতন্ত্র বিদ্যমান। শুধু আধুনিক সমাজ কেন, হয়ত বলা যায় সব সমাজই পিতৃতন্ত্রের দ্বারা চালিত। পুরুষতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যই এই যে, পুরুষের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সে তত্ত্ব বা থিওরি গড়ে ওঠে তাই একমাত্র বৈধ মত। 'পুরুষের জানাটাই' হয়ে যায় 'মানুষের জানা'। এর ফলে গড়ে ওঠে একটা একঝোঁকা সভ্যতা যেখানে মেয়েদের অভিজ্ঞতা, তাদের পরিপ্রেক্ষিত, তত্ত্বে ও প্রয়োগে সম্মান পায় না। পুরুষশাসিত সমাজে প্রথমে নারী-পুরুষের ভূমিকা ভাগ করা হয়। মনে করা হয় নারী ও পুরুষ স্বভাবের দিক থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত। বলা হয় স্ত্রী স্বভাবের বৈশিষ্ট্য তার প্রাণসৃষ্টি, প্রাণপালনের ক্ষমতা, তার প্রেম, তার মমতা, তার সংবেগ। এই সবই নারীবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত— মান ও বিত্তের সঙ্গে যুক্ত নয়। নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্ব-সাধনায় এই বৃত্তিগুলির কোনো স্থান নেই। অথচ বিজ্ঞান একান্তভাবে নৈর্ব্যক্তিক সাধনা-নির্ভর। তা সে সাধনা তত্ত্বেরই হোক বা তথ্যেরই হোক। বিজ্ঞানমনস্কতার অর্থই হল কোনো সমস্যাকে বস্তুনিষ্ঠরূপে বোঝা, বিষয়ীনিষ্ঠ ভাবে নয়। তাই যদি বিজ্ঞানের আদর্শ হয় তাহলে তাকে কখনোই পক্ষপাত দোষে দুষ্ট বলা যায় না, কারণ পক্ষপাত অনপেক্ষতাই হলো বিজ্ঞানের লক্ষ্য। বিজ্ঞানকে হতে হবে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে নিরপেক্ষ। এই নিরপেক্ষতা নারীপুরুষ বিষয়ে শুধু নয়, সব রকম বিজ্ঞান বহির্ভূত অনুষঙ্গই হবে বর্জনীয়। এমন নিরপেক্ষতাকেই বলা হয় অবজেকটিভিটি বা বিষয় নিষ্ঠা। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হল তার গবেষণার বিষয়ের বিবরণ দেওয়া, তার একটা বোধগম্য ব্যাখ্যা দেওয়া, অপরাপর বিষয়ের সঙ্গে তার কার্য-কারণ সম্পর্ক বোঝানো। এই প্রক্রিয়ায় আপন মনের মাধুরী মিশায়ে দেখার কোনো অবকাশ নেই।

বিজ্ঞানের এমন একটা বিষয়নিষ্ঠ নিরপেক্ষ পরিচিতি দেওয়াটাই দস্তুর। বিজ্ঞানীরা নিজেরা খুব জোরের সঙ্গে দাবি করেন যে, তাঁরা তাঁদের গবেষণাগারে যে কাজ করেন তার উদ্দেশ্য এমনই অবজেকটিভ এক্সপেরিমেন্ট? এ প্রশ্নটি নিয়ে বহু চুলচেরা বিচার হয়েছে। এ বিষয়ে নানা অভিমত আছে। একদল মনে করেন আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাগুলি যাপিত অভিজ্ঞতা, কিন্তু আমরা যে মুহূর্তে স্বচেতনভাবে তত্ত্ব চর্চার কোটিতে প্রবেশ করি অমনি আমরা আমাদের ব্যক্তি-সত্তাকে দূরে সরিয়ে নৈর্ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার চর্চা করি বা করার চেষ্টা করি। বিদেশে 'এজ অব এনলাইটেনমেন্ট'-এর সময় থেকেই দাবি করা হচ্ছে যে বিজ্ঞানে সবসময় ব্যক্তি-অনপেক্ষ গবেষণা করার আদর্শ অনুসরণ করা হয়। এই বিবাদের অপর শরিক মনে করেন যে, অভিজ্ঞতা মাত্রই স্থান-কাল-পাত্র নির্ভর। ব্যক্তি একটি বিষয়কে দেখে তার পরিপ্রেক্ষিত থেকে, তার সমাজ, তার সভ্যতার বীক্ষায়। ব্যক্তির কোনো দেশোত্তীর্ণ কালোত্তীর্ণ অবস্থান নেই। ফলে অভিজ্ঞতা মাত্রই যাপিত অভিজ্ঞতা। এঁদের মতে অভিজ্ঞতা থেকে তথ্য আহরণ করা হয়।

ফলে বিজ্ঞানের তথ্যসূত্র নৈর্ব্যক্তিক হতে পারে না, তা সর্বদাই যাপিত অভিজ্ঞতা নির্ভর। তাই যদি হয় তা হলে শত চেষ্টা সত্ত্বেও বিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠ হওয়া বা নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব নয়। বলাই বাহুল্য নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে না পারলে নানা রকম বৈষম্য ভাবনার সঙ্গে বিজ্ঞান জড়িয়ে পড়তে পারে। তাহলে দেখা যাচ্ছে তর্কটা এক জায়গায় এসে দানা বাঁধছে। প্রশ্নটা হল— বিজ্ঞানের অনুসন্ধান পদ্ধতি বা মেথডোলজি, তার এপিস্টেমোলজি বা জ্ঞানতন্ত্র কি নৈর্ব্যক্তিক খুলে বলতে গেলে বলা যায় বিজ্ঞানীর প্রত্যক্ষ, তার বর্ণনা, তার ব্যাখ্যা, তার তত্ত্ব কি বিজ্ঞানীর যাপিত অভিজ্ঞতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, তা কি একান্তই নৈর্ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা নির্ভর? এখানে অনেকে বাস্তব ও আদর্শের পার্থক্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলবেন যে, মনে রাখতে হবে বিজ্ঞানী যা করেন ও তার যা করার কথা তা সব সময় এক না-ও হতে পারে। বিজ্ঞানীর নৈর্ব্যক্তিক হওয়ার কথা।

নারীবাদীরা এই বিতর্কে বিভিন্ন অবস্থান নিয়ে থাকেন। তবে তাঁরা সকলে একটা ব্যাপারে একমত যে যদি মনন বা চেষ্টার কোনো অনুষঙ্গে যাপিত অভিজ্ঞতার প্রাসঙ্গিকতা থাকে তবে যেন নারী-পুরুষ উভয়ের যাপিত অভিজ্ঞতার খবর নেওয়া হয়। পরবর্তী তত্ত্ব সৃজনের স্তরেও যেন উভয়ের অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হয়। এমন যেন না বলা হয় যে, পুরুষের অভিজ্ঞতাটাই নৈর্ব্যক্তিক, অতএব পুরুষের জানাটা 'মানুষের' জানা। এই প্রসঙ্গে অনেকগুলি কূট তর্কের অবকাশ আছে। তার একটি তর্ক এইরূপ যাপিত অভিজ্ঞতার অনিবার্যতা স্বীকার করার অর্থ আপেক্ষিকতা স্বীকার করা। তাহলে সব সত্য সব তত্ত্বই কি আপেক্ষিক? 'অনিবার্য' বা 'নেসোসিটি' শব্দটি কি তাহলে তার তাৎপর্য হারাবে? 'ধ্রুব জ্ঞান' এই শব্দজোট কি তাহলে নিরর্থক? সব বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান যদি বিষয়ী সাপেক্ষ হয় তা হলে 'বস্তুনিষ্ঠ' আর 'বিষয়ীনিষ্ঠ' হওয়ার মধ্যে বিশেষ তফাত থাকে না। সাধারণভাবে মনে করা হয় কোনো বিষয়ে জানা মানে সেবিষয়ে সত্যকে জানা। 'জানা' যদি যাপন নির্ভর হয় তাহলে কোনো কিছুকেই তো তার স্বরূপে জানা যাবে না— জানতে হবে আমাদের চেতনার রঙ মিশিয়ে। এইভাবে চলতে চলতে জ্ঞান বা নলেজ ও আইডিওলজি বা ভাবাদর্শের মধ্যে প্রভেদ থাকবে না। এই পরিণতি বিজ্ঞানের জন্য সর্বনাশ ডেকে আনবে। বিজ্ঞান তখন ভাবাদর্শে পর্যবসিত হবে। অনেকে মনে করেন— হলে হবে, অন্তত জ্ঞান যে স্বরূপত অধ্রুব তা আমরা জানতে পারব। যাঁরা এই মত পোষণ করেন তাঁরা বলেন যে জ্ঞানকে ধ্রুবত্বের সঙ্গে অঙ্গীভূত করে এতদিন আমরা ভাবের ঘরে চুরি করে চলেছি। যে তত্ত্ব যখন ফলপ্রসূ হয় তাকেই তখন ধ্রুব বলে মনে হয়। এ ছাড়া কোন্ জ্ঞান কখন সঠিক বলে নির্বাচিত হবে তা অনেকগুলো আনুষঙ্গিক কারণের উপর নির্ভর করে। দুটি প্রতিযোগী তত্ত্বের মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত সরল, যেটি অপরাপর স্বীকৃত তত্ত্বের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ সেটিকে সঠিক মনে করি। এ ছাড়া বিজ্ঞান মহলেও রেষারেষি আছে। যে গোষ্ঠী যত শক্তিশালী তার প্রবর্তিত তত্ত্ব সেই অনুপাতে জনপ্রিয় হয় কারণ সরকার, মিডিয়া ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সেই গোষ্ঠী অধিক মাত্রায় সমর্থন পায়। উদাহরণস্বরূপ চিকিৎসা শাস্ত্রের কথা বলা যায়— একই রোগের কারণ ও চিকিৎসা অ্যালোপ্যাথিতে যেমন করা হয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে তা করা হয় না, হোমিওপ্যাথি আবার তার নিজস্ব বিধান দেয়। চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে কোন্‌টি

ঠিক, কোন্‌টি বিজ্ঞানসম্মত, তা বিচার করার উপায় আছে কি? নাকি আমাদের বলতে হবে, যে-ক্ষেত্রে যেটা কার্যকর সে ক্ষেত্রে সেটাই গ্রহণীয়? তাহলে চিকিৎসা হয়ে যায় প্র্যাগম্যাটিক বা প্রায়োগিক, তাকে আর অবজেকটিভ বা বস্তুনিষ্ঠ বলা যায় না। এই তর্কের সঙ্গে অনুস্যূত দ্বিতীয় একটি বিতর্ক হল যে 'বিজ্ঞান কি নৈর্ব্যক্তিক, নাকি অনুষঙ্গ-সাপেক্ষ?' এই প্রশ্নের উত্তর যাই দেওয়া হোক, তার সঙ্গে নারীবাদের সম্পর্ক কোথায়?

ধরা যাক সিদ্ধান্ত হল যে বিজ্ঞান অনুষঙ্গ-নির্ভর। অনুষঙ্গ বলতে কি শুধু নারী পুরুষের লিঙ্গ প্রেক্ষিতগুলোকেই বোঝাবে? কেউ বলতেই পারে বর্ণ ভেদে 'যাপিত অভিজ্ঞতার' ভেদ হয়, যেমন হয় বয়স ভেদে। সব রকম যাপনের প্রভেদকে স্বীকার করে নিয়ে বললেই হয় বিজ্ঞান অনুষঙ্গ নির্ভর-শাস্ত্র, নারীর আর বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতের গুরুত্ব নেই। প্রসঙ্গত বলে রাখি এই মতটি একজন বিশিষ্ট নারী-ই প্রকাশ করেছেন। তার নাম সুজান হ্যাক। হ্যাকের মূল গবেষণার বিষয় তর্কশাস্ত্র ও জ্ঞানতন্ত্র। তিনি বলেন যে, 'বিজ্ঞান চর্চা সমাজ সাপেক্ষ' এই কথাটি হয় ঠিক অথবা ভুল। কথাটি ঠিক যদি হয়ও, তার সঙ্গে নারীবাদের পরিপ্রেক্ষিতের কোনো বিশেষ সম্পর্ক নেই; সব রকম পরিপ্রেক্ষিতই তখন প্রাসঙ্গিক হয়ে যাবে। তিনি মনে করেন নারীবাদীরা বিজ্ঞানের জ্ঞানতন্ত্রের নারীবাদী ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছেন, কারণ তাঁদের এই প্রকল্প প্রকৃষ্ট জ্ঞানতন্ত্রও নয়, নারীবাদও নয়।

এর পালটা মত যাঁরা পোষণ করেন তাঁরা বলবেন লিঙ্গ বৈষম্য যদি সমাজে থাকে তাহলে তা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে বা প্রবেশ করার সুযোগ খোঁজে। লিঙ্গ বৈষম্য যে সব সময় চোখে পড়ে তা নয়, প্রচ্ছন্ন বৈষম্য সমাজের চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে। এমন অনেক বৈষম্য আছে যা দেখতে দেখতে নারী পুরুষ এতই অভ্যস্ত যে সেটা আর বৈষম্য বলে চিহ্নিত হয় না। তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নীরব থাকতে থাকতে আমরা তার কথা ভুলেই যাই, যার ফলে বৈষম্যটি ক্রমশ আমাদের চোখের আড়ালে বাসা বাঁধে। সমালোচনামূলক দৃষ্টি দিয়ে নারীপুরুষের আচার আচরণ মননকে বিশ্লেষণ করলে তবেই প্রচ্ছন্ন লিঙ্গ বৈষম্যগুলি নজরে পড়ে। ফলে বিজ্ঞানে বা দর্শনে বা অন্য কোনো শাস্ত্রে লিঙ্গ বৈষম্য স্থান পেয়েছে কিনা তা বিচার না করে বলা যায় না। এই খোঁজ যে কেবল লিঙ্গ বৈষম্য অনুসন্ধানে সীমিত থাকা উচিত তা নয়। অপরাপর বৈষম্য তুলে ধরারও প্রক্রিয়া থাকা উচিত। যদিও এই ব্যাপারে নারীবাদের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। তার কারণ হিসেবে দুটি যুক্তি দেওয়া যায়— প্রথম হল বৈষম্য অন্বেষণের প্রকল্প অন্যান্য নিপীড়িত গোষ্ঠীর তুলনায় নারীবাদীরা অনেক আগেই নিয়েছেন। ঐতিহাসিক কারণে তাঁরা এ ব্যাপারে অন্যদের চেয়ে বেশি নিপুণ। বৈষম্য চিহ্নিত করার কতগুলি পন্থা পদ্ধতির উদ্ভাবন তারা করেছেন। এ বিষয়ে তারা এটাই প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন যে অপরাপর নির্যাতিত গোষ্ঠী রীতিমত নারীবাদের কাছ থেকে এ ব্যাপারে পাঠ নিতে আরম্ভ করেছে। তত্ত্বের কোটিতেও যে বৈষম্যের অনুপ্রবেশ ঘটেছে একথাটা নারীবাদীরাই প্রথমে বলেন। এই বৈষম্যের স্বরূপ উদঘাটনের কাজে তাঁরা ১৯৭০ সাল থেকেই ব্যাপৃত রয়েছেন। নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিজ্ঞানের জ্ঞানতন্ত্রকে দেখার প্রাসঙ্গিকতা প্রতিষ্ঠায় দ্বিতীয় যুক্তিটি নিম্নরূপ ঃ ঐতিহাসিকভাবে বিজ্ঞানের জয়জয়কারের সঙ্গে পুরুষতন্ত্রের জয়যাত্রা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি যত বাড়ছে, নারী ও প্রকৃতির অবদমনও সেই হারে বাড়ছে। বিজ্ঞানের গোড়ার ইতিহাসের সঙ্গে নারী ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। পরিবারের পুষ্টির জন্য গাছ গাছড়া চেনার কাজ নারীরাই করতেন, যেমন তাঁদের উদ্ভাবন করতে হয়েছে খাদ্য সংরক্ষণের নানা প্রক্রিয়া। চাষের কাজেও নারী বিশেষ ভাবে যুক্ত ছিলেন। দেখা যাচ্ছে, যেই মেশিন ও টেকনলজির ব্যবহার শুরু হয়েছে বা যেই কোনো শ্রমের বিনিময়ে টাকা পাওয়া গেছে অমনি পুরুষ সেই কর্মক্ষেত্রটি গ্রাস করেছে। জানি না হাজার বছর আগে মেধা চুক্তির প্রবর্তন হলে নারীর অবস্থান কী হত। আশা করা যায় সর্বব্যাপী এই অস্বীকৃত গ্রহণ বা ডিনায়েড ডিপেণ্ডেন্সের ছবি থাকত না। বিজ্ঞানের জ্ঞানতন্ত্রে নারীবাদের বিশেষ ভূমিকা থাকার তৃতীয় কারণটি গুরুত্বপূর্ণ। দেখা যাচ্ছে অনেকেই বিজ্ঞানের সামাজিক অনুষঙ্গের গুরুত্বের কথা স্বীকার করেন। বিজ্ঞানকে নৈর্ব্যক্তিক বলেন না, তথাপি তাঁরা সামাজিক অনুষঙ্গ থেকে সুবিধেজনক ভাবে নারীর যাপিত অভিজ্ঞতাটিকে বাদ দিয়ে দেন। তাঁরা এমন ভাবে কথা বলেন যাতে মনে হয় সামাজিক অনুষঙ্গ বর্ণনায় লিঙ্গ-বিভাজন কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্যই নয়। লিঙ্গ-রাজনীতির চাপে যাপনের প্রেক্ষাপটের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয় একথা আর তাঁদের গোচরেই থাকে না। সমাজের এই মাত্রার বিষয়ে নীরব থাকাটাকে নারীবাদীরা 'নীরবতার চক্রান্ত' আখ্যা দিয়েছেন। নীরব থাকলে সহজেই সমস্যাগুলি অগোচর হয়ে যায়। পিতৃতন্ত্রের ঝোঁকটা সাধারণীকরণের দিকে। বৈশিষ্ট্যের কথা ভুলে গিয়ে বা সে আলোচনা মুলতুবি রেখে একটা অনুগত সামান্য ধর্ম অন্বেষণের দিকে প্রবণতা থাকে। এর ফলে অনেক সময় একটি অবৈধ সাধারণীকরণ ঘটে যায়। বিজ্ঞানেরও এমন ঝোঁক আছে— বিজ্ঞান চায় কতকগুলি জেনারাল প্রিন্সিপল বা সাধারণ নীতি নিরূপণ করতে যা পরে দেশ-কাল-অনপেক্ষভাবে ব্যবহার করা যাবে। যেমন ম্যালেরিয়া চিকিৎসা সর্বত্রই একই ফর্মুলা মাফিক করা হয়। নারীবাদীরা চিকিৎসা শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্বন্ধে বিশেষ করে সন্দিহান। তারা বলেন যে, স্ত্রী পুরুষের পার্থক্য ক্রোমোজোম-এর গঠন ও হরমোনের প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে করা সত্ত্বেও সাধারণ রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে কেন স্ত্রী পুরুষকে একই নিদান দেওয়া হয়? উত্তরে কেউ বলতে পারে বিজ্ঞানের অপ্রণিধানজনিত এইসব ত্রুটি আর একটু বস্তুনিষ্ঠ হলেই দূর করা যাবে— এর জন্য নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন নেই। নারীবাদীরা বলেন এটা প্রণিধান বা অপ্রণিধানের প্রশ্ন নয়— প্রশ্ন হচ্ছে লিঙ্গ বা জেন্ডারকে ব্যাখ্যার মাত্রা বা ক্যাটিগরি অব ইন্টারপ্রিটেশন রূপে স্বীকার করার।

এতদিন যাবৎ লিঙ্গ বা জেন্ডারকে ব্যাখ্যার মাত্রা হিসেবে স্বীকার না করার ফলে শুধু অপ্রণিধান দোষ হয়েছে তা নয়, এটা নিছক এরর অব অমিশন নয়। এখানে যুক্ত হয়ে আছে ভিন্নধর্মী একটা দোষ যাকে বলা যায় সক্রিয় অবদমন বা এরর অব কমিশন। 'মানুষ' কথাটি উভয় লিঙ্গের পরিচয় বহন না করে যখন কেবল পুরুষের স্বরূপধর্মের প্রতিফলন হয়ে যায় তখন সক্রিয়ভাবে নারীর স্বরূপধর্মকে মানুষের ধর্ম থেকে বাদ দেওয়া হয়ে থাকে। হয় মনে করা হয় নারী যে অংশে পুরুষ থেকে, ভাষান্তরে মানুষ থেকে ভিন্ন, সেখানে সে মানবেতর জাতিভুক্ত; অর্থাৎ যেখানে সে জীবজগতের গণ্ডির সদস্যা, অথবা মনে করা হয় নারী পুরুষে কোনো প্রভেদ নেই। নারী পুরুষের অভেদ স্থাপন করা হয় নারীর বৈশিষ্ট্যের দিকে বিমুখ হয়ে

ম্যালেরিয়া চিকিৎসায় যেমন হয়। নারীকে তার পৃথক হরমোনাদির গঠনের জন্য ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা ভিন্ন করে দেখা হয় না।

নারীকে জীব জগতের কাছাকাছি ভাবার কারণ হল তাকে জীবধাত্রী ও জীবপালিনীর ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা করা হয়, ও বলা হয় যে, পুরুষ প্রকৃতির এই প্রবল তাগিদ থেকে মুক্ত। নারীবাদীরা মনে করেন 'নারী', 'পুরুষ' তথা 'মানুষ'-এর এই পরিচয়ের একদেশদর্শিতা কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়। এর পেছনে কাজ করে যাচ্ছে লিঙ্গরাজনীতি। এই রাজনীতির নিহিত কাঠামোটি এইরূপ— প্রথমত যেখানে গুরুত্বপূর্ণ প্রভেদ আছে সেখানে প্রভেদ অস্বীকার করা বা প্রভেদের গুরুত্ব অস্বীকার করা, দ্বিতীয়ত, সাধারণীকরণের সূত্রটি সর্বদা পুরুষের পরিপ্রেক্ষিত লাঞ্ছিত হওয়া সত্ত্বেও সূত্রটিকে নৈর্ব্যক্তিক বলে পেশ করা। একবার মানবধর্মকে পুরুষধর্মের সঙ্গে এক করে ভাবলে পূর্ণ মানুষ হওয়ার জন্য পুরুষকে আর আলাদা করে পরিশ্রম করতে হয় না— সে তার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকলেই তার মানুষের ধর্ম পালন করা হবে। বলা হয় নারী সংবেদনশীল আর পুরুষ বিমূর্ত ভাবনার অধিকারী। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'পুরুষ প্রাণের ক্ষেত্রে ছুটি পেয়েছে (নারী ছুটি পায়নি) বলেই বিত্তক্ষেত্রে সে আপন সৃষ্টিকার্যের পত্তন করতে পারলে। সাহিত্য কলায় বিজ্ঞানে দর্শনে ধর্মে বিধি ব্যবস্থায় মিলিয়ে যাকে আমরা সভ্যতা বলি সে হল প্রাণপ্রকৃতির পলাতক ছেলে পুরুষের সৃষ্টি।' (পশ্চিম যাত্রী ডায়ারি) সভ্যতা যদি পুরুষের সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং সেই সভ্যতায় যদি নারী অংশ গ্রহণ করে তাহলে বলতে হবে পুরুষ সৃষ্টি ধর্ম, দর্শন, বিধিব্যবস্থায় নারীর অন্তর্ভুক্তি ঘটছে। একটি সভ্যতার সদস্য হওয়া ও অংশগ্রহণকারী সদস্য হওয়ার মধ্যে যে পার্থক্য তা নিতান্ত তুচ্ছ নয়। অবস্থাটা শিলা রোবোথমের একটি বিখ্যাত বই-এর শিরোনামের সাহায্যে বর্ণনা করা যায়— বইটির নাম ওম্যান'স কনশাসনেস, ম্যান'স ওয়ার্লড। অর্থাৎ নারী তার স্বকীয় চিত্তক্ষেত্র নিয়ে পুরুষের জগতে বাস করে। এ হেন পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা যখন বলে যে 'পার্শ্বে রাখ যদি সঙ্কটে সম্পদে, সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে সহায় হতে পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে' তখন বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না যে কঠিন ব্রতটি পুরুষের ব্রত এবং নারীকে এখানে চেনা যাবে পুরুষতন্ত্রের দ্বারা আরোপিত নারীস্বরূপে।

জগৎ একই রকম থাকবে শুধু সেই জগতে নারী একটা সদস্যপদ পাবে এটা নারীবাদীদের দাবি নয়, কারণ এই জগৎ প্রাণপ্রকৃতির পলাতক ছেলে পুরুষের সৃষ্টি। নারীবাদীরা চান এই জগৎ নারী পুরুষ উভয়ে সৃষ্টি করবে, সেইজন্য তাঁরা রিপ্রেসেন্টেশন বা প্রতিনিধিত্বের কথা বলে। এই প্রতিনিধিত্ব দুরকম হতে পারে— এক ধরনের প্রতিনিধিত্ব বর্তমানে প্রচলিত যেখানে পুরুষতন্ত্রের সৃষ্ট অভিধায় নারী তার লিঙ্গস্বরূপ বিকাশ করছে সেখানে শক্তির অর্থ ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, আগ্রাসন, খবরদারি ; যেখানে স্নেহের অর্থ আত্মপক্ষ বিসর্জন ; যেখানে প্রগতির অর্থ পরিবেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ-বিস্তার। নারী আর একভাবে প্রতিনিধিত্ব পেতে পারে যেখানে সে তার যাপিত অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি চাইতে পারে। নারীর অভিজ্ঞতায় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অধিক শক্তিশালী হওয়া যায়, যেখানে স্নেহ মানে সংযুক্তি কিন্তু আত্মপক্ষ বিসর্জন নয়, যেখানে প্রগতির অর্থ সবরকম সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে পারা— বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি অণু পরমাণুর

অস্তিত্ব সুরক্ষিত করা। পুরুষ আর নারীর যদি এমন বিপরীতমুখী বীক্ষা হয় তাহলে সভ্যতা গঠনে কি একটা দ্বান্দ্বিকতা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থাকে না? তাছাড়া পুরুষতন্ত্রের বীক্ষাটাই বা বাতিল হবে কেন? এটা তো একটি পরীক্ষিত বীক্ষা যার ওপর ভর করে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সভ্যতাগুলি গড়ে উঠেছে— অতীতের গ্রিস রোম থেকে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সভ্যতা সবই তো নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্ব সাধনার উপাসক। এই সভ্যতার কৃতির পরম্পরা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। যদি মেনেও নিই যে পুরুষতন্ত্র এক ধরনের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে চলেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিশ্বায়নের ফলে ক্ষুদ্র সংস্কৃতিগুলি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে মনে করলে তা রোধ করার চেষ্টা করতে হবে, তা বলে বিকল্প সংস্কৃতি বা সভ্যতার কথা ভাববার প্রয়োজন কেন হবে?

যাঁরা এই ব্যবস্থার তুঙ্গে আছেন এবং এই ব্যবস্থার চরম কার্যকারিতা বা এফিশিয়েন্সি অনুভব করছেন তাঁরা চাইবেন এই ব্যবস্থা কায়েম থাক। নারীবাদীরা প্রশ্ন করেন— 'সত্যিই কি আমরা ভালো আছি?' বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির রমরমার যুগ কি তার ভয়াবহ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ধীরে ধীরে প্রকাশ করছে না? এই ভয়াবহ নৈর্ব্যক্তিক সাধারণীকরণের চাপে সব চেয়ে বেশি পিষ্ট হয়েছে নারী এবং নিসর্গ, এতদিন সভ্যতার প্রান্তে যারা আছে। নারীবাদীরা চান এই প্রান্তীয় স্বরগুলি যেন ভাষা পায়, যেন তারা তাদের যাপিত অভিজ্ঞতা, তাদের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার কথা বলতে পারে। সকলে যদি সমস্বরে কথা বলে তবে বিবাদ বাধবে বড় আকারের। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জন্য যে সাধারণীকরণ প্রয়োজন, যে এফিশিয়েন্সি দরকার তা কোথা থেকে আসবে? এর উত্তরে নারীবাদীরা বলবেন, সকলের সব কথা সমান গুরুত্ব পেতে পারে না। কিন্তু বিচার না করেই কারোর কথা অবজ্ঞা করাটাও ঠিক নয়। সব শরিকের মধ্যে নিরন্তর একটা ডায়ালগ বা কথোপকথন চালিয়ে যেতে হবে।

প্রশ্ন হচ্ছে বিজ্ঞানের অনুষঙ্গে ডায়ালগ কী নিয়ে চলবে? জীববিজ্ঞানীরা কি প্রশ্ন করবেন যে 'এটি একটি মলিক্যুল কি না?' বা 'এটি মাস্টার মলিক্যুল কি না?' নাকি ডায়ালগ বা বিতর্ক হবে সমস্যা নির্বাচন নিয়ে? যেমন, মানুষের কোষের ক্লোন করা উচিত কি না। এই বিষয়ে নারীরা কী বলে আর পুরুষরা কী বলে এই নিয়ে বিতর্ক হবে? নাকি বিতর্কটা আরও সামাজিক স্তরে হবে— জিজ্ঞেস করা হবে মেয়েরা কেন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তেমন অবদান রাখতে পারছে না, যেমন তাঁরা রাখছেন শিল্প বা সাহিত্যের ক্ষেত্রে? বিজ্ঞানচর্চার অনেক স্তর আছে, আমরা শুরু করি গবেষণার সমস্যা নির্ধারণ দিয়ে। এই স্তরে পুরুষতান্ত্রিক পক্ষপাত কাজ করছে বলে কারোরই কোনো আপত্তি হবে না— সত্যিই তো সমাজের স্বার্থে যখন জনসংখ্যা কমানোর কথা ভাবা হয় তখন গিনিপিগ করা হয় মেয়েদের। ওষুধের কোম্পানি জন্মনিরোধক বড়ি উদ্ভাবনে যত অর্থ ব্যয় করেন পুরুষের নির্বীর্যকরণের গবেষণায় আদপেই তত খরচ করা হয় না। এই একদেশদর্শিতার জন্য বিজ্ঞানী নিজেকে দায়ী মনে নাও করতে পারেন। এটি একটি আর্থসামাজিক পলিসি বা নির্বাচনের ব্যাপার।

সমস্যা নির্বাচনের পর বিজ্ঞানের আসল কাজ শুরু হয়। প্রথমে চলে ডেটা কালেকশন বা তথ্য সংগ্রহ ও পরে তার ব্যাখ্যন বা এক্সপ্লানেশান, পরবর্তী পর্যায়ে আসে তত্ত্ব নির্মাণ বা

থিওরি। বিজ্ঞানের ঘোষিত আদর্শ অনুসারে এই তিনটি কাজই বিষয়ী নিরপেক্ষ বস্তুনিষ্ঠ ভাবে করার কথা। করার কথা কিন্তু করা হয় না। এই 'না-করাটা' অনিবার্য, নাকি অনিচ্ছাকৃত গাফিলতির জন্য, তা ভেবে দেখতে হয়। নারীবাদীরা বিজ্ঞানের গবেষণার পর পর উদাহরণ দাখিল করে বলেন যে, বিজ্ঞানের গবেষণা কখনই বিষয়ীনিরপেক্ষ বস্তুনিষ্ঠ শাস্ত্র নয়। আশ্চর্য হতে হয় যে, এই উদাহরণগুলির কোনোটাই সমাজ বিজ্ঞান থেকে নেওয়া নয়, প্রতিটি উদাহরণ নেওয়া হয়েছে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান থেকে। সমাজবিজ্ঞানকে যদিও বা বিষয়ী-সাপেক্ষ বলা যায়, বিশুদ্ধ বিজ্ঞানকে তা বলার প্রচলন নেই।

বিজ্ঞানের তত্ত্ব নির্মাণ কখনই নৈর্ব্যক্তিক নয়। বিজ্ঞানী নানা প্রভাবে প্রভাবিত হয়, তার ধর্ম, রাজনৈতিক বিশ্বাস ও সংস্কার দ্বারা সে প্রভাবিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জীববিজ্ঞানে এভোলিউশন বা বিবর্তনকে প্রগতি বা প্রোগ্রেসের সঙ্গে এক করে দেখা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, প্রগতি বলতে কী বোঝায়? এই প্রশ্নের উত্তরের ওপর নির্ভর করবে প্রগতি ঘটেছে কি না। প্রথাগতভাবে বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন জীবজগতে প্রোগ্রেস নির্ভর করে প্রতিযোগিতা, সংগ্রাম ও আধিপত্য বিস্তারের ওপর। অপরপক্ষে নারীবাদীরা মনে করেন জীবজগতে প্রোগ্রেস ঘটে যখন একে অপরের প্রতি সহনশীল হয়, যখন একে অপরের প্রয়োজন সম্পর্কে সজাগ থাকে, যখন যূথবদ্ধ জীবনযাপন করা হয় ইত্যাদি। প্রোগ্রেসের এই দুটি ব্যাখ্যা পাশাপাশি রাখলে বোঝা যায় প্রথম ব্যাখ্যাটি পুরুষতন্ত্রের মূল্য কাঠামোর সঙ্গে খাপ খায় আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি নারীবাদী মূল্যবোধের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। একই কনসেপ্ট বা ধারণার এই ভিন্নধর্মী ব্যাখ্যা থেকে প্রমাণিত হয় যে বিজ্ঞান শুধু মাত্র তার নিজস্ব যুক্তি বা ইন্টারনাল লজিক ও বস্তুনিষ্ঠ অভিজ্ঞতার দ্বারা চালিত নয়, বিজ্ঞান নানান রকম সামাজিক চাপের কাছেও নতি স্বীকার করে। বিজ্ঞান যে নৈর্ব্যক্তিক নয় তা প্রমাণ করার জন্য জীববিজ্ঞান থেকে আর একটি উদাহরণও দেওয়া যেতে পারে। 'জেনেটিক মেকানিজম' সম্বন্ধে দুটি ভিন্ন ব্যাখ্যা যুগপৎ প্রচলিত আছে। একটি ব্যাখ্যাতত্ত্বের নাম 'দ মাস্টার মলিক্যুল কনসেপ্ট' এবং অপরটি হল 'দ স্টেডি স্টেট কনসেপ্ট'। প্রথম ব্যাখ্যাটি মলিক্যুলের মধ্যে উচ্চ-নীচ স্তর-বিন্যাস স্বীকার করে দ্বিতীয় ব্যাখ্যানুসারে মলিক্যুলে মলিক্যুলে যে সম্বন্ধ তা উচ্চ নীচ স্তর বিন্যস্ত নয়। প্রথম তত্ত্বটি অনুসারে একটি প্রধান বা মাস্টার মলিক্যুল থাকে জেনোটিক মেকানিজম-এর মধ্যে, অপরাপর মলিক্যুলগুলি সেটিকে অনুসরণ করে চলে। দ্বিতীয় তত্ত্ব অনুসারে মলিক্যুলগুলি চিরগতিশীল, স্বনির্ভর। একটি তত্ত্ব অনুসারে মলিক্যুল-এর বৈশিষ্ট্য অপর কোনো প্রধান মলিক্যুল-এর ওপর নির্ভর করে না— বরঞ্চ বলা যায় তারা পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করে। এদুটি ব্যাখ্যার মধ্যে বিজ্ঞানী মহলে উপর নীচ বিন্যস্ত ব্যাখ্যাটি অধিক প্রচলিত ও জনপ্রিয়। নারীবাদীরা মনে করেন তার কারণ হচ্ছে যে প্রথমটি পিতৃতন্ত্রের প্রোগ্রেসের ভাবনাটিকে সমর্থন করে এবং দ্বিতীয়টি নারীবাদী আদর্শের অনুগামী। দুটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মধ্যে যখন একটিকে নির্বাচন করার পেছনে শুধু বৈজ্ঞানিক সমাজের সমর্থন নয়, সে সব সংস্থান গবেষণায় অর্থের অনুদান জোগায় তাদেরও মতামত এবং আরও অনেক চাপের প্রভাবে একটি ব্যাখ্যা নির্বাচিত হয় ও একটি নাকচ হয়। নারীবাদীরা মনে করেন মাস্টার মলিক্যুলের মডেলটিতে উচ্চনীচ স্তর বিন্যাস

সমর্থিত হয় পরস্পর নির্ভরশীলতার ব্যাখ্যা মানা হয় না। এই মডেলটির সমর্থন একটা কাকতালীয় ব্যাপার বলে নারীবাদীরা মনে করেন না— তাঁরা মনে করেন এর সঙ্গে পুরুষতন্ত্রের যোগ আছে।

একটি সমস্যার ব্যাখ্যার জন্য বিভিন্ন মডেল পেশ করাটা জীববিজ্ঞানের একচেটিয়া ব্যাপার নয়। পদার্থবিদ্যার তুলনায় জীববিজ্ঞানকে অনেক সময় কম অগ্রসর, কম নির্ভরযোগ্য মনে হয়। জীববিজ্ঞানের ব্যাখ্যার মডেলে সে দ্বিধা কখনও বা নজরে পড়ে। দাবি করা হয় যে পদার্থ বিজ্ঞানে এমন প্রতিযোগী ব্যাখ্যা দেওয়া হয় না। ফলে বিজ্ঞানচর্চার জগতে পদার্থবিদ্যাকেই আদর্শ নৈর্ব্যক্তিক শাস্ত্র বলে ধরার রেওয়াজ আছে। কিন্তু নারীবাদীদের অনেকেই মনে করেন প্রকৃতিকে নিউটন সাহেব যতটা নিয়মনিষ্ঠ মনে করেন বা রিলেটিভিটি থিওরি যেমন মনে করেন প্রকৃতি তেমন নয়। ইদানীং কিছু ফরাসি বিজ্ঞানী বলছেন যে প্রকৃতি আসলে 'কেয়টিক' বা সংপ্লবাত্মক অর্থাৎ প্রকৃতি বেনিয়মে চলে, বিজ্ঞান তার সুবিধের জন্য প্রকৃতির ওপর নিয়ম আরোপ করে।

বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় আন্তঃকলহ রয়েছে। তার মানে কি বিজ্ঞান বিষয়নিষ্ঠ নয়, ইতিহাস অনক্ষেপও নয়— বিজ্ঞান কি তবে সব দিক থেকে অনুষঙ্গ-নির্ভর? সেই পুরোনো তর্ক আবার ফিরে আসে— বিজ্ঞান কি নৈর্ব্যক্তিক? নাকি বিজ্ঞান এতটাই বিষয়নিষ্ঠ যে তা একটি আইডিওলজির নামান্তর। বিজ্ঞানের পদ্ধতিকে কি এমন দুটি আত্যন্তিক ভাগে ভাগ না করে একটি মধ্যপথ অবলম্বন করা যায়? পজিটিভিস্টদের মতো কট্টর বস্তুনিষ্ঠতা অনুসরণ না করার অর্থ যে আইডিওলজি করা তা নয়। একটা বড় সংখ্যক নারীবাদী মনে করেন যে, বিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠ হওয়ার আদর্শ প্রশংসনীয়, কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক হওয়ার আদর্শটি অলীক। আমাদের আপিত অভিজ্ঞতাকে নানা অনুষঙ্গ প্রভাবিত করে। তাই অনুষঙ্গ-অনপেক্ষ যাপিত অভিজ্ঞতা অর্জন বিজ্ঞানের লক্ষ্য হওয়া উচিতই নয়। বিভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত তথ্যকে যুক্তি দিয়ে যাচাই করতে হবে। যত বেশি দৃষ্টিকোণ থেকে একটা সমস্যাকে দেখা যায়, ততই দেখাটা সমৃদ্ধ হয়। বিশেষ করে যারা সমাজের প্রান্তে আছে তাদের বীক্ষার একটা বিশেষ মূল্য আছে। যেহেতু তারা দীর্ঘ দিন ধরে ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত তারা বিশেষ এক ধরনের বীক্ষায় অভ্যস্ত যা আমাদের চর্চায় এক নতুন মাত্রা দিতে পারে। সমাজের যাপিত অভিজ্ঞতার একটা গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হল মানুষের লিঙ্গ-পরিচয় বা তার জেন্ডার। বিজ্ঞান যখন বীক্ষণের প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করে তখন অবশ্যই এই পরিপ্রেক্ষিতটিও বিচার্য। নারীবাদীরা মনে করেন ব্যাখ্যার অনেকান্ততা অস্বীকার করা যায় না। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তাই সবসময় সকল পক্ষের বক্তব্যকে মর্যাদা দিতে হবে এবং পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে কনসেনসাসে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে সিদ্ধান্ত যাই নেওয়া হোক, তা কখনই পূর্ণমূল্যায়ন এবং সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। পাশাপাশি একাধিক ব্যাখ্যা বর্তমান থাকাটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ। এর ফলে বিজ্ঞানের সমাজে কায়েমি স্বার্থ শিকড় বিস্তার করতে পারবে না। এক কথায় বলতে গেলে নারীবাদীরা চান বিজ্ঞানচর্চায় অন্যান্য অনুষঙ্গের সঙ্গে লিঙ্গ-অনুষঙ্গের গুরুত্ব স্বীকার করা হোক আর তাঁরা চান সার্বিকভাবে জ্ঞানের অনেকান্ত স্বরূপ স্বীকার করে বৈজ্ঞানিক চর্চায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার পাশাপাশি অনন্ত ডায়ালগ চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ।